

জাতের বড়াই

Sharif Abu Hayat Opu

2015-09-05 06:04:00 +0600 +0600

10 MIN READ

প্রথম বর্ষের ছাত্র আমি তখন, জিইবি-১০৫ ইউনিটটি নিতেন শ্রদ্ধেয় আনোয়ার স্যার। তিনি আমাদের নেচার বনাম নার্চার বিতর্ক পড়িয়েছিলেন। মানুষ কেমন হবে তা নির্ধারণ করে কোনটি - জিনোম, যা তার কোষে কোষে আছে নাকি পারিপার্শ্বিক পরিবেশ, যাতে সে বেড়ে উঠেছে? জানলাম দুটোরই অবদান আছে, অর্ধেক-অর্ধেক। কিন্তু পরবর্তীতে দেখলাম শুধু এ-দুটো দিয়েই সব ব্যাখ্যা করা যায়না। মানুষের আরো আছে রুহ বা আত্মা—যার বুদ্ধিমত্তা ও স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি আছে। এর বলেই মানুষ জিনোম এবং পরিবেশ উভয়ের প্রভাবকে জয় করতে পারে। মানুষের আছে বেছে নেবার ক্ষমতা - এই বেছে নেবার ক্ষমতাই মানুষকে জৈবিক পশুত্বের পর্যায় থেকে মনুষ্যত্বের স্তরে উঠিয়ে দেয়।

দুঃখজনক হলেও সত্য, যুগে যুগে মানুষ নিজেদের বিচার করার সময় জন্মের যতটা দাম দিয়েছে, কাজের ততটা দাম দেয়নি। ‘জন্ম হোক যথা তথা, কর্ম হোক ভাল’ — ধরনের নীতিবাক্যগুলো ভাব সম্প্রসারণ করা ছাড়া অন্য কাজে লাগেনি। নায়ক চৌধুরি বংশের আর নায়িকা খান বংশের - এই দ্বন্দ্ব নিয়ে হাজারখানেক বাংলা সিনেমা তৈরী হয়েছে। সামন্তযুগের বংশ বা গোত্র নিয়ে মানুষের যে অবস্থানটা ছিল, পুঁজিবাদী যুগে সেটা বৃহত্তর পরিসরে ‘জাতি’র চেহারা নিয়ে হাজির হয়েছে। মানুষ এখন বংশের বড়াই না করে জাতীয়তাবাদের গৌরব করে। জাতীয়তাবাদের উগ্র মূর্তির চেহারা আমরা দেখি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়। হিটলার বিশ্বাস করতো একমাত্র আর্য জার্মানদের অধিকার রয়েছে সমগ্র বিশ্ব শাসনের কারণ আর্য জার্মানরা সৃষ্টিগতভাবে, জেনেটিকালি অন্য জাতিগুলোর চেয়ে উন্নত। সে ১ কোটি ১০ লক্ষেরও বেশি মানুষকে হত্যা করেছিল শুধু এই নীতিবোধে যে, সব জাতের কর্তব্য জার্মানদের সেবা করা এবং যারা তা করবেনা তাদের পৃথিবীতে জীবিত থাকার অধিকার নেই।

১৯৪৫ সালে হিটলারের পতন ঘটলেও জাত্যাভিমানের কিন্তু অবসান ঘটেনি। জাতিগত কোন্দলের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা দেখি পোলিশদের প্রতি রাশানদের বর্বরতা, তুরস্কে আর্মেনিয়ানদের গণহত্যা, ইরাকে কুর্দিদের নিশ্চিহ্নাভিযান, রুয়ান্ডার হতু-তুতসিদের মাঝে সংঘটিত হত্যাকাণ্ড, শ্রীলঙ্কার তামিল-সিংহলিজ গৃহযুদ্ধ, বসনিয়ায় সার্ব কর্তৃক বসনিয়ানদের গণহত্যা ইত্যাদি ইত্যাদি। এথনিক ক্লিনসিং এর পিছনে লুকিয়ে আছে এক জাতির মানুষদের প্রতি আরেক জাতির প্রবল ঘৃণা। আজকের তথাকথিত সুসভ্য জাত ফরাসি আর ইংরেজরা পনেরশ থেকে আঠারোশ শতাব্দীতে যা করেছে তাকে কুকুরের কামড়াকামড়ি বললে কম বলা হয়। ল্যান্ড অফ ফ্রিডম নামে পরিচিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আদি নিবাসী ছোট ছোট নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীগুলোর প্রতি বর্বরতার ইতিহাস অনেক ঢাকা-চুকো দেবার পরেও যতটা বেরিয়ে আসে তা জানলে হতবাক হতে হয়।

আরো ন্যাক্সারজনক ব্যাপার হল এক জাতি আরেক জাতিসত্তাকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে তাদের সম্পদকে দখল করবে, এটাকে অন্যায় হিসেবেও দেখা হয়না। ডারউইনিজমের হাত ধরে আসা সোশ্যাল ডারউইনিজম বলে—যে জাতি বেশি সক্ষম সে জাতি অন্য জাতিকে ধরে খাবে। সার্ভাইভল অফ দ্য ফিটেস্ট, এটা নাকি প্রকৃতির নিয়ম—এতে অন্যায় কিছু নেই! হোমো স্যাপিয়েন্স জাত দুভাগে বিভক্ত—সাদা চামড়ার হোমো সুপেরিয়র আর বাদামি-কালো চামড়ার হোমো ইনফেরিয়র। এমন বিশ্বাস নিয়ে বিখ্যাত দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট, শ্যোপেনহাওয়ার, ফ্রিডরিখ হেগেল, অগাস্ট কোয়ং থেকে শুরু করে আজকের হাভার্ডের বিজ্ঞানীরা বই অবধি লিখেছেন। ইউরোপীয় এনলাইটমেন্টের গুরু ভলতেয়ার সন্দেহ প্রকাশ করে লিখেছিলেন যে নিগ্রোরা বাঁদর থেকে এসেছে নাকি বাঁদররা নিগ্রো থেকে এসেছে তা গবেষণার বিষয়!

অথচ সত্যি কথা এই যে মানুষ যা কিছু নিয়ে গর্ববোধ করে—গায়ের রঙ, মেধা, বংশ-মর্যাদা, সৌভাগ্য, রূপ-লাবণ্য, শারীরিক গঠন—কোন কিছুই তার নিজের কামাই না, সবই জন্মসূত্রের মুফতে পাওয়া। আমি এই যে দেহ নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি, সেই আমি আমার অস্তিত্বে আসার আগে আমার প্রাপ্ত দেহের কোন অংশের ব্যাপারেই কিছু করিনি। করার মত কোন বোধই তো ছিলনা। আমার আমি - আমার আত্মা, বিবেক-বোধ, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমেত—এই আমি, পুরোটা একটা সিঙ্গেল প্যাকেজ, পুরোটাই

আল্লাহর দান। কোন বুদ্ধিমান মানুষ কি শ্রষ্টা যা ‘ভিক্ষা’ দিলেন তা নিয়ে অহংকার করতে পারে? আমার যাতে কোন কৃতিত্ব নেই সেটা নিয়ে গর্ব করার কিইবা আছে?

আমি বাংলাদেশে জন্মেছি। কিন্তু আমি ডেনমার্কজন্মে স্ক্যান্ডিনেভিয়ান হতে পারতাম আবার নাইজেরিয়াতে জন্মে কালো মানুষও হতে পারতাম। আমার জন্মভূমি বা জাতিসত্তা নির্ধারণে আমার কোন হাত ছিলনা—এটা পুরোপুরি স্রষ্টাপ্রদত্ত একটা ব্যাপার। আমার মনে পড়েনা যে আমি আল্লাহকে বলেছিলাম—আল্লাহ বাংলাদেশ জায়গাটা খুব সুন্দর ওখানে আমার জন্ম দিও। আল্লাহ যে আমাকে সাহারার শুকনো ধু-ধু কোন মরুভূমিতে জন্ম দেননি, কিংবা কানাডার আলবার্টার বরফরাজ্যের অধিবাসী করে পাঠাননি সেজন্য আমি সত্যি আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞ। আমি বৃষ্টি আর পাহাড় দু’টি খুব ভালোবাসলেও আল্লাহ যে আমাকে আসামের চেরাপুঞ্জি বা হিমালয়ের কোন পাহাড়ি গ্রামে জন্ম দিয়ে পাঠাননি সেজন্য আমি মোটেই দুঃখিত নই। আমি তথাকথিত উন্নত বিশ্বের নাগরিক নই বলে আমার যেমন আক্ষেপ নেই তেমনি মক্কায় জন্ম হলে বায়তুল্লাহতে প্রতি ওয়াক্ত স্বলাত আদায় করে ১ লক্ষ গুণ প্রতিদান পেতে পারতাম—সেটা নিয়েও আমার মনঃতাপ নেই।

কেন নেই? কারণ আমি জানি আল্লাহ আমার রব্ব, এবং তিনি যে আমাকে বাংলাদেশের যশোরে জন্ম দিয়েছেন, ঢাকায় বড় করে তুলেছেন তার পিছনে তার একটি উদ্দেশ্য আছে। এই উদ্দেশ্যটা আমি জানিনা। কিন্তু তাঁর যে আমাকে নিয়ে একটি পরিকল্পনা আছে তা সুনিশ্চিত। আরেকটু বড় আঙ্গিকে দেখলে—এই সমগ্র বিশ্বচরাচর সৃষ্টি ও প্রতিপালনের মহাপরিকল্পনার আমিও একটা অংশ। আল্লাহ যাই করেন তাঁর অসীম জ্ঞানের ভিত্তিতে যেটা ভালো বোঝেন সেটাই করেন। তাঁর এই সাজিয়ে দেয়া প্রেক্ষাপটে আমার ভূমিকা—আল্লাহ আমাকে যখন যে পরিস্থিতিতে ফেলবেন তখন আমাকে বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহার করে এমন একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে যাতে তিনি সন্তুষ্ট হন। আল্লাহ কিসে সন্তুষ্ট হবেন সেটা জানতে পারবো আল কুর'আন এবং মুহাম্মদ (সাঃ) এর সহিহ সুন্নাহ থেকে।

আল্লাহ সুবহানাহ্ সুরা হুজুরাতে খুব স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন -

হে মানবজাতি, আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে, পরে তোমাদের বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পারো।

আল্লাহ আমাকে বাঙালি জাতিতে সৃষ্টি করেছেন যেন আমি অন্যান্য জাতির কাছে পরিচিতি দিতে পারি। আল্লাহ জাতিভেদ এ জন্য সৃষ্টি করেননি যেন আমি বাঙালি সংস্কৃতি নিয়ে অহংকার করতে পারি। একজন মানুষ ভারতে জন্মেছে দেখে তাকে আমি ভারতীয় হিসেবে অপছন্দ করবো, আবার পাকিস্তানের নাগরিক দেখেই তাকে ঘৃণায় মুখ সরিয়ে নেব—একারণে আল্লাহ একেকজনকে একেক জাতিসত্তা দিয়ে পৃথিবীতে পাঠাননি। মানুষের জন্মপরিচয়টা যে আল্লাহর কাছে গুরুত্ব রাখেনা সেটা একই আয়াতের বাকি অংশে আল্লাহ তা’আলা জানিয়ে দিলেন -

তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই আল্লাহর কাছে অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে আল্লাহকে অধিক ভয় করে।

মানুষকে তার জন্মের ভিত্তিতে ভাগ করা যাবেনা, ভাগ করতে হবে তার কাজের ভিত্তিতে। আর কে কী করবে তা নির্ভর করে সে কী বিশ্বাস করে তার উপরে। যে বিশ্বাস করে আল্লাহ সব কিছু দেখছেন সে প্রবৃত্তির তাড়নায় মুহূর্তের অসতর্কতায় একটা পাপ করে ফেললেও আল্লাহর কাছে ফিরে আসে, ক্ষমা চায়। কিন্তু যে কুর'আনে বিশ্বাসী নয় সে গরীব মানুষকে উচ্চ সুদে টাকা ধার দিয়ে ভাবে খুব ভালো কাজ করছি। ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষ জাতি তাই দু'ভাগে বিভক্ত—বিশ্বাসী/ অবিশ্বাসী, যারা জানে/ যারা জানেনা, যারা মানে/ যারা মানেনা, জালাতী/ জাহান্নামী।

একজন মুসলিম তার জাতীয়তাবাদ নিয়ে গর্ব করতে পারেনা। রসুলুল্লাহ (সাঃ) শিক্ষা দিলেন -

মানুষ যেন তাদের মৃত পূর্বপুরুষকে নিয়ে গর্ব না করে। ... আল্লাহ অজ্ঞতার যুগের সাম্প্রদায়িকতা ও বংশগৌরব নিষিদ্ধ করেছেন। নিশ্চয় একজন মানুষ হয় সং বিশ্বাসী অথবা হতভাগ্য পাপাচারী। সমস্ত মানুষ আদমের সন্তান আর আদম ছিলেন মাটির তৈরী। [১]

আরবের শ্রেষ্ঠ বংশে জন্ম নেয়া মুহাম্মদ (সাঃ) আরব জাতীয়তাবাদ সহ অন্য যেকোন ধরনের জাতীয়তাবাদের মূলোৎপাটন করে গেছেন অনেক আগেই -

অনারবদের উপর আরবদের শ্রেষ্ঠত্ব নেই, আরবদের উপরেও অনারবদের শ্রেষ্ঠত্ব নেই, নেই সাদার উপরে কালোদের অথবা কালোর উপরে সাদাদের। শ্রেষ্ঠত্ব শুধু তাকওয়াতে। [২]

তাকওয়া মানে আল্লাহকে ভয় করা, তাঁর আনুগত্য করা। যে আল্লাহর শাস্তিকে ভয় পেয়ে যত বেশি খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকবে সে তত বেশি ভাল মানুষ। যে আল্লাহর পুরস্কারের আশায় যত বেশি ভাল কাজ করবে তার শ্রেষ্ঠত্ব তত বেশি।

অহংকার করা ইসলামে নিষিদ্ধ, যার অন্তরে অণুমাত্র অহমিকা থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবেন। বেতন নিয়ে গর্ব করলে গর্ব হয়, ক্ষমতা নিয়ে গর্ব করলে গর্ব হয়, দেশ নিয়ে গর্ব করলে সেটা হয়ে যায় দেশপ্রেম? উন্নত জীবনের লোভে বিদেশে অভিবাসী হয়ে চোস্ট ইংরেজিতে “আই এম প্রাউড টু বি আ বাংলাদেশী” বললে দেশকে ভালোবাসা হয়, আর বিদ্যুত-বিভ্রাট, নিশ্চল রাজপথ আর আগুনে বাজার সহ্য করে দেশ ছেড়ে যাবোনা বলে মাটি কামড়ে থাকা মুসলিম হয়ে যায় তালেবান, দেশদ্রোহী, রাজাকার। দলের নামের আগে “বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদী” ট্যাগ থাকলেই দুর্নীতি করে সম্পদের পাহাড় গড়া জায়েজ হয়ে যায়? দুর্নীতি করেছে তো কি হয়েছে, দেশকে তো ভালোবাসে। এ যেন সেই গ্রামীণ প্রবাদ—“লাথি মেরেছে তো কি হয়েছে, আমার গরুই তো মেরেছে।”

একজন মানুষ যখন অহংকার করে তখন সে শুধু আল্লাহর নয় মানুষেরও অপ্রিয়পাত্র হয়। একজন ধনী ব্যক্তি যদি কথায় কথায় তার সম্পদের বর্ণনা দেন সেটা কি শুনতে ভালো লাগে? ক্লাসের সামনের দিকের কেউ যখন বুঝিয়ে দেয় সে আমার চেয়ে ভাল ছাত্র তখন কি ভালো লাগে? ক্যাডার যখন শাসিয়ে যায়—‘আমার দল কিন্তু ক্ষমতায়’ তখন? অস্ট্রেলিয়ায় যখন ভারতীয়দের পেটানো হয় তখন আমরা বলি রেসিস্ট। শ্বেতাঙ্গ চরমপন্থীরা অভিবাসীদের বের করে দিতে চাইলেও আমরা বলি যেনোফোবিক। অথচ আমরা যখন গাই—‘সকল দেশের সেরা ... সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি’ তখন আমরা কি বোঝাতে চাই? নাকি আমরা যা বলি তা মিন করিনা। আসলে মিন ঠিকই করি, ক্ষমতায় কুলায় না দেখে পেরে উঠিনা। যাদের সাথে পেরে উঠি—উত্তরবঙ্গের সাঁওতাল কিংবা মধুপুরের গারো—তাদের জমি আমরা কেড়ে নেই, তাদের বাসভূমি-অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান নষ্ট করে গাছ কেটে বন উজাড় করে আমরা ঘুরতে যাবার পার্কবানাই।

জাতীয়তাবাদের পরিণাম—শত্রুতা, বিভেদ, সাম্প্রদায়িকতা। এতে বিভেদ বাড়তেই থাকে, কমে না। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের দাবী করেও মানুষ বিভক্ত হয় এলাকাভিত্তিক ভেদাভেদিতে। সিলটি, চাটগাঁইয়া, নোয়াখাইল্যা, ঢাকাইয়া, বরিশাইল্যা, রংপুরিয়া—বিভেদের কি শেষ আছে? বিয়ের বাজারে একটা মেয়ের সব অর্জন তুচ্ছ হয়ে যায় তার ‘দেশের বাড়ি’র কারণে। যোগ্যতা ভুলুষ্ঠিত হয় চাকরির প্রমোশনে, গুরুত্ব পায় ‘এলাকার ছেলে’—এই পরিচয়। অথচ মদিনার আনসার আর মক্কার মুহাজিরদের ভিতরে জন্মস্থানভিত্তিক সামান্য কোন্দলটুকুও রসুল (সাঃ) সহ্য করেননি। তিনি বিভেদের স্লোগানকে ‘দুর্গন্ধময় অজ্ঞতার যুগের ডাক’ হিসেবে চিহ্নিত করে গেছেন।

ইসলাম আমাদের শেখায় বন্ধুত্ব, ভালোবাসা। চাইনিজ বা ওলন্দাজ, আফগান বা বিহারি, ককেশীয় বা নিগ্রো, ভারতীয় বা বাংলাদেশী, উত্তরবঙ্গ বা দক্ষিণবঙ্গ—যেই ইসলামকে দ্বীন হিসেবে মেনে নিয়েছে সেই আমার ভাই। আমরা একে অপরের ব্যাখায় কষ্ট পাই, সুখে সুখী হই, সে পৃথিবীর যে অংশেই থাকুক না কেন। কিন্তু আমার আপন ভাইও যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ইলাহ হিসেবে মানে, রসুলুল্লাহ (সাঃ) কে অগ্রাহ্য করে তবে আমি তার জাতীয়তার অন্তর্ভুক্ত নই। আমি জন্মসূত্রে বাঙালি,

বিবেক সূত্রে মুসলিম—এভাবেই আমি জাতীয়তাকে বেছে নেই। বাংলাদেশের প্রতি আমি আমার কর্তব্য করে যাই, জন্মভূমি হিসেবে একে ভালোবেসে যাই কিন্তু আমি বাংলাদেশী বলে মিথ্যা গর্ব করিনা। তবে আমি সুপথপ্রাপ্ত এই মর্মেও গর্ব করিনা, কারণ ব্যক্তি হিসেবে আমাকে আল্লাহ দয়া করে পথ দেখিয়েছেন, ইসলাম কি সেটা বুঝে-শুনে মানার সামর্থ্য দিয়েছেন। অন্তর্ভুক্ত করেছেন এমন এক জাতির যা দেশের সীমানা পেরিয়ে, কালের গল্ভী ছাড়িয়ে পুরো পৃথিবীর সর্বযুগের সকল সত্যসন্ধানী মানুষকে একত্রিত করেছে।

আল্লাহ আমাদের সেই সত্যসন্ধানী মানুষদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবার সামর্থ্য দিন, আমিন।

* * *

[১] আবু দাউদ ৫১১৬, তিরমিযি ৪২৩৩। ইবন তাইমিয়া কিতাবুল ইক্কাতিদা গ্রন্থে হাদিসটিকে হাসান বলেছেন।

[২] মুসনাদে আহমাদ ৫/৪১১। ইবন তাইমিয়া কিতাবুল ইক্কাতিদা গ্রন্থে হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন।